কেন সমাজতন্ত্র?

আলবার্ট আইনস্টাই

(গত সংখ্যার পর–বাকি অংশ)

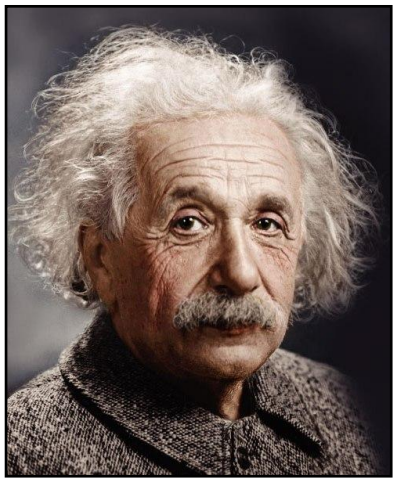

আদিম রীতি-পদ্ধতিসমূহের তুলনামূলক অনুসন্ধানের মাধ্যমে আধুনিক নৃবিদ্যা আমাদের জানিয়েছে যে, মানুষের সামাজিক আচরণ বিভিন্ন রকম হতে পারে, এবং এটা নির্ভর করে সমাজে আধিপত্যকারী সংগঠনের উপর এবং বিরাজমান সাংস্কৃতিক মননের উপর। এর ফলে যারা মানবজাতির বৃহৎ অংশের উন্নতির জন্য কাজ করে যাচ্ছেন তাদেরকে আমি আশাবাদী হতে বলবো কারণ, মানব অস্তিত্বকে বাতিল ঘোষণা করা যায় না, নিজের শারীরিক অস্তিত্বের জন্য হলেও নিজেরা একে অপরকে হত্যা করবে না অথবা নিজেকে ধ্বস্ন করার মত নির্মম পরিস্থিতির সৃষ্টি করবে না।

যদি আমরা নিজেদের প্রশ্ন করি যে, জীবনকে আরামদায়ক করার জন্য এই সামজিক কাঠামো এবং মানুষের সাংস্কৃতিক আচরণ কীভাবে পরিবর্তিত হবে, আমাদের সবসময় কিছু বিষয় সম্বন্ধে সচেতন থাকতে হবে কারণ কিছু কিছু নিয়ামক আমরা কখনোই বদলাতে পারি না। আগেই বলা হয়েছে যে জৈবিক গঠনতন্ত্রের কোন কিছুই কোন ব্যবহারিক কারণেই পরিবর্তন করা যায় না। উপরন্তু বিগত কয়েক শতাব্দী ধরে সংগঠিত প্রযুক্তি ও জনসংখ্যায় যে পরিবর্তনের ফলেও যে অবস্থার তৈরি হয়েছে তা টিকে থাকবে। তুলনামূলকভাবে ঘনবসতিপূর্ণ স্থানে কোন জনগোষ্ঠীকে যদি অপরিহার্য দ্রব্য সামগ্রী নিয়ে তাদের অস্তিত্ব রক্ষা করতে হয় তাহলে এক ধরণের উৎপাদন যন্ত্র কেন্দ্রিক শ্রমবিভাগ আবশ্যক। সে অলস সময়ের অবসান ঘটেছে যখন ছোট গোষ্ঠীগুলোও নিজেরা স্বয়ংসম্পূর্ণ ছিলো। এটা খুব বেশি বাড়িয়ে বলা হবে না যে, মানবজাতির আজ তৈরি হয়েছে সমগ্র গ্রহজুড়ে উৎপাদকশ্রেণি ওভোক্তাশ্রেণি।

এ পর্যায়ে আমি এখন সংক্ষেপে বলতে পারি এই সংকটের মূল ব্যাপারটা আমার কাছে কি মনে হয়? এ সংকট ব্যক্তির সাথে সমাজের সম্পর্কের সাথে জড়িত। ব্যক্তি অন্য যেকোন সময়ের তুলনায় সমাজের উপর তার নির্ভরশীলতার ব্যাপারে অনেক বেশি সচেতন। কিন্তু সে এই নির্ভরশীলতাকে অস্তিবাচক সম্পদ হিসেবে দেখে না, জৈবিক বন্ধন ভাবে না, রক্ষাকারী শক্তি মনে হয় না বরং তার স্বাভাবিক অধিকার ও অর্থনৈতিক অস্তিত্বের প্রতি হুমকি মনে করে। সমাজে তার এমন অবস্থান তৈরি হয় যে, তার ইগোকেন্দ্রিক আকাঙ্ক্ষাগুলি সবসময় তুঙ্গে থাকে, আর তার সামাজিক তাড়নাগুলি স্বাভাবিকভাবেই থাকে দুর্বল আর আস্তে আস্তে কমতে থাকে। মানুষ সমাজের যে স্তরেই থাকুক না কেন দিনে দিনে এই ক্রমহ্রাসমান প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। নিজের ইগোর জালে অনিচ্ছাকৃতভাবে বন্দী হয়ে মানুষ নিরাপত্তাহীনতা অনুভব করে, একাকীত্ব লাভ করে আর জীবনের সহজ, স্বাভাবিক ও সাবলীল আনন্দলাভ থেকে বঞ্চিত হয়। মানুষ শুধুমাত্র সমাজের প্রতি আত্মনিবেদনের মাধ্যমেই ক্ষুব্ধ ও ঝঞ্ঝাপূর্ণ জীবনের মানে খুঁজে বের করতে পারে।

আমার মতে সকল প্রকার অশুভের উৎস হলো আজকের পুঁজিবাদী সমাজে বিদ্যমান অর্থনৈতিক বৈষম্য। আমরা আমাদের সামনে দেখতে পাই এক বিশাল উৎপাদক শ্রেণি যারা তাদের যৌথ শ্রমের ফল থেকে পরস্পরকে বঞ্চিত করতে অবিরাম চেষ্টা করছে, শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে নয়, বরং সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠিত আইনের মাধ্যমে। এ প্রসঙ্গে এটা বোঝা গুরুত্বপূর্ণ যে, উৎপাদনের উপায় তথা ভোক্তাপণ্য উৎপাদনের জন্য যে সামগ্রিক উৎপাদকযন্ত্র ও মূলধনজাতীয় দ্রব্যের প্রয়োজন তা আইনিভাবে আধিকাংশেই মানুষের ব্যক্তিগত সম্পত্তি।

আলোচনার সুবিধার্থে এখন থেকে আমি যাদের উৎপাদনের উপায়ের উপর মালিকানা নেই তাদেরকে 'শ্রমিকশ্রেণি' বলে আখ্যায়িত করব, যদিও এই শব্দটির যথার্থ প্রায়োগিক জায়গা নয়। উৎপাদনের উপায়ের উপর যার মালিকানা থাকে সে শ্রমিকের শ্রমকে কিনে নেয়ার মতো অবস্থানে থাকে। উৎপাদনযন্ত্রে শ্রমিক নতুন দ্রব্য তৈরি করে যা পুঁজিবাদীর সম্পত্তিতে পরিণত হয়। এখানে ধর্তব্য হলো শ্রমিকের উৎপন্ন দ্রব্য ও তার মজুরির মধ্যে প্রকৃত মূল্যে নির্ণায়িত সম্পর্কের ব্যাপারটি। যেহেতু শ্রমচুক্তির ব্যাপারটি 'বিনামূল্যে' নির্ধারিত হয়, তাই শ্রমিক যা গ্রহণ করে তা প্রকৃতমূল্যে নির্ণায়িত নয়, বরং তার ন্যূনতম প্রয়োজন এবং পুঁজিপতির প্রয়োজন এবং শ্রমের যোগানের উপর নির্ভর করে। আমাদের অবশ্যই এটা বোঝা দরকার যে, শ্রমিকের মজুরি তার উৎপাদিত দ্রব্যের মূল্য অনুযায়ী নির্ধারিত নয়।

ব্যক্তিগত সম্পত্তি অল্প কিছু ব্যক্তির কুক্ষিগত হতে থাকে। এর কারণ অংশত পুঁজির প্রতিযোগীতা ও প্রযুক্তিগত উন্নয়ন। ক্রমবর্ধিষ্ণু শ্রমবিভাগের ফলে ছোট ছোট উৎপাদন ইউনিটের জায়গায় বড় বড় ইউনিট গড়ে উঠে। এর ফলে তৈরি হয় এমন এক ব্যবস্থা যেখানে মূলধন জড়ো হতে থাকে সীমিত কিছু ব্যক্তির কাছে, এবং এই শক্তিকে গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক সমাজের দ্বারা আর নিয়ন্ত্রন করা যায় না। এটা অত্যন্ত স্পষ্ট কারণ নিজেদের প্রয়োজনেই পুঁজিপতিরা নির্বাহী বিভাগকে নির্বাচনের দ্বারা আলাদা রেখে, রাজনৈতিক দলগুলিকে আর্থিক ভাবে পৃষ্ঠপোষকতা করে, প্রভাবিত করে এবং এদের মধ্যে থেকেই আবার বিভিন্ন নির্বাহী প্রতিনিধি নিয়োগ করে। এর পরিণতি হলো সমাজের এই সব প্রতিনিধিরা সুবিধাবঞ্চিত শ্রেণির স্বার্থ যথেষ্ট পরিমাণে রক্ষা করতে পারেনা। আর এ অবস্থায় এই সব পুঁজিপতিরাই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সকল প্রকার প্রধান সংবাদ মাধ্যমকে–তথ্য উৎসকে নিয়ন্ত্রণ করে (প্রেস, রেডিও, শিক্ষা)। এর ফলে একজন ব্যক্তির পক্ষে নৈর্ব্যক্তিক উপসংহারে উপনীত হওয়া বা তার রাজনৈতিক অধিকারসমূহের সঠিক ব্যবহার দুষ্কর এবং কিছু ক্ষেত্রে অসম্ভব হয়ে পড়ে।

মূলধনের উপর ব্যক্তিগত মালিকানার ধারণাকেন্দ্রিক এই অর্থনীতির বিরাজমান অবস্থাকে দুটি মূল নীতির দ্বারা সুচিত করা যায় : প্রথমত উৎপাদনের উপায় (মূলধন) ব্যক্তিগত মালিকানায়, মালিকেরা নিজের ইচ্ছামতো এর বিনিময় করে এবং দ্বিতীয়ত বিনামূল্যের শ্রমচুক্তি। অবশ্য এর ফলে প্রকৃতপক্ষে বিশুদ্ধ পুঁজিবাদী সমাজ বলতে কোন কিছু নেই। এটা বোঝা উচিত যে, শ্রমিকশ্রেণিকে তিক্ত রাজনৈতিক সঙ্ঘাতের মধ্য দিয়ে কিছু শ্রেণির শ্রমিকের জন্য 'বিনামূল্যের শ্রমচুক্তির' চেয়ে ভালো কোনো অবস্থায় পৌঁছে গেছে। তবে মোটের উপর এই অবস্থা 'বিশুদ্ধ' পুঁজিবাদ থেকে খুব বেশি পৃথক নয়।

উৎপাদন করা হয় মুনাফার জন্য, চাহিদা অনুযায়ী নয়। এমন কোনো ব্যবস্থা নেই যে সমর্থ ও ইচ্ছুক ব্যক্তিদের জন্য সব সময় কর্মসংস্থানের সুযোগ রয়েছে, একটা বিশাল 'বেকার জনতা' সবসময়ই পাওয়া যায়। একজন শ্রমিক সবসময় তার কাজ হারানোর ভয়ে থাকে। যেহেতু বেকার এবং নিম্ন আয়ের শ্রমিকেরা মুনাফাজনক বাজারের তৈরি করে না, তাই ভোক্তা দ্রব্যের উৎপাদন সীমিত আকারে ঘটে যার ফলাফল বিপুল দুর্ভোগ। প্রযুক্তিগত উন্নয়ন

প্রায়শই সকলের শ্রমের বোঝা কমানোর চেয়ে বেশি করে বেকারত্বের সৃষ্টি করে। মূলধনের বণ্টন ও সুষ্ঠু ব্যবহার না হবার ফলে যে ক্রমবর্ধমান হতাশার উদ্রেক হচ্ছে তার জন্য দায়ী হলো মুনাফাকেন্দ্রিক চিন্তা আর সেই সাথে পুঁজিপতিদের মধ্যে তীব্র প্রতিযোগীতা। এই অসীম প্রতিযোগীতার ফলে ঘটে শ্রমের বিরাট অপচয় ও সামাজিক সচেতনতার প্রতি ব্যক্তির অনীহা যা আমি আগেই উল্লেখ করেছি।

ব্যক্তিমানুষের এই অনীহাকে আমি পুঁজিবাদের সবচেয়ে বড় সমস্যা মনে করি। সম্পূর্ণ শিক্ষাব্যবস্থা এই সমস্যা ভোগ করে। এক ধরণের অতিশায়িত প্রতযোগীতামূলক ভীতি একজন ছাত্রের মধ্যে ঢুকিয়ে দেয়া হয়, তাকে ভবিষ্যত জীবনের জন্য অর্জিত সাফল্যের সাধনার শিক্ষা দেয়া হয়।

আমি মনে করি এই সব ভয়াবহ সমস্যার দূর করা সম্ভব সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির প্রতিষ্ঠা ও একই সাথে এমন এক শিক্ষা ব্যবস্থার বিকাশ যার উদ্দিষ্ট হবে সামাজিক লক্ষ্যসমূহ অর্জনের দিকে। এধরণের ব্যবস্থায় উৎপাদনের উপায়সমূহের মালিকানা থাকবে সমাজের হাতে এবং উপযোগের ব্যবহার ঘটবে সুষ্ঠু। একটি পরিকল্পিত অর্থনীতি যা উৎপাদনের সাথে সমাজের চাহিদার সমন্বয় সাধন করে, সকল কর্মক্ষম মানুষের মধ্যে সঠিকভাবে কাজের বণ্টন করবে এবং প্রত্যেক নর-নারী ও শিশুর জীবন নির্বাহ নিশ্চিত করবে। প্রত্যেক ব্যক্তির শিক্ষা তার সহজাত প্রবৃত্তির উন্নয়নের পাশাপাশি সমাজে ক্ষমতা ও সাফল্যের জায়গায় এক ধরণের দায়িত্ববোধ তেরি করবে।

এটা খেয়াল রাখতে হবে যে পরিকল্পিত অর্থনীতির মানেই সমাজতন্ত্র নয়। পরিকল্পিত অর্থনীতি ব্যক্তির দাসত্বের মধ্য দিয়েও অর্জিত হতে পারে। সমাজতন্ত্রে উত্তরণের জন্য কয়েকটি দুরহ সমাজ-রাজনৈতিক সমস্যার সমাধান করতে হবে। কীভাবে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতার কেন্দ্রিয়করণ থেকে মুক্তিপাওয়া যাবে, আমলাতন্ত্রের সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী হওয়া ও অনিয়ন্ত্রিত অবস্থা ঠেকানো যাবে? ব্যক্তির স্বার্থ রক্ষা করে বিপরীতে কীভাবে গণতান্ত্রিক আমলাতন্ত্রের ক্ষমতা নিশ্চিত করা যায়?

সমাজতন্ত্রের লক্ষ্য ও সমস্যা সম্বন্ধে স্পষ্টতা আমাদের এই পরিবর্তনের যুগে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। যেহেতু বর্তমানে এই সমস্যাগুলি নিয়ে মুক্ত ও অবাধ আলোচনার খুব বেশি সুযোগ নেই আমি মনে করি জনকল্যাণে এই পত্রিকার একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে।